আমাদের টেক্সটাইল শিল্প

বাড়ছে

- বিনিয়োগ
- কর্মসংস্থান
- উৎপাদন

নারী শ্রমিকদের বিকল্প কর্মক্ষেত্র

বদরুল আলম নাবিল ও নওরীণ সুলতানা

শহর ছাড়িয়ে অনেকখানি দূরে, দুই দিকে ধানক্ষেত আর বাগানবাড়ি এমন একটি দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে গাজীপুরের মনিপুর গ্রাম। এই গ্রামের বিস্তীর্ণ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে গিভেন্সি স্পিনিং মিলের ক্যাম্পাস। ৫৫১ জন নারী এবং ৩২ জন পুরুষ শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে এই মিলে। বছরে প্রায় ৪৫ কেজি ইয়ার্ন উৎপাদন হয় এই মিলে। শুধু এই একটি গিভেন্সি নয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল এসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) তথ্য অনুযায়ী দেশে এখন টেক্সটাইল ও স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৬৪৩টি। মিলের সংখ্যা এবং এখাতে বিনিয়োগ বাড়ছে দ্রুত। গত ডিসেম্বরে বিটিএমএ-এর সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিল ৫৮৮টি, এই কয়েক মাসে আরো ৫৫টি বেড়েছে।

এই মিলগুলোতে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য দু'ধরনের কাপড় দরকার হয়। একটি ওভেন অন্যটি নিট কাপড়। নিটের ক্ষেত্রে ৯০ ভাগ এবং ওভেনের ৩০ ভাগ কাপড়ের সরবরাহ করছে আমাদের দেশীয় মিলগুলো। বাদবাকি আমদানির মাধ্যমে চাহিদা মেটানো হয়। এক্ষেত্রে দেশীয় কাপড় থেকে তৈরি গার্মেন্টস রপ্তানি মাধ্যমে বছরে আয় হয় ২.২৬৩৩ বিলিয়ন ডলার আর মূল্য সংযোজন ১.৮৬৪৩ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে দেশীয়ভাবে তৈরি বেডশিট, পর্দাসহ বিভিন্ন টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে আমাদের দেশ থেকে। এ হিসেবে টেক্সটাইল শিল্পকে একটি বিকাশমান শিল্প হিসেবে ধরা হয়। বিটিএমএ চেয়ারম্যান এমএ আউয়াল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশের টেক্সটাইল খাতের উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হলে ব্যবসায় মূল্য সংযোজনের হার, বাজার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত হবে।

সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ বিতর্ক

২০০৫ সাল নাগাদ মুক্ত বাণিজ্যের বিশ্বে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক শিল্প প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে কোটা সুবিধা পাচ্ছে তা উঠে যাবে। তখন আমেরিকা ও ইউরোপের ক্রেতারা চীন, ভারতের মতো যে সব দেশ কম মূল্যে স্বল্পতম সময়ে ভালো মানের পোশাক দিতে পারবে তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়বে। আমাদের প্রতিযোগী

তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড়, কাপড় থেকে ফেব্রিকস্

দেশগুলোর টেক্সটাইল শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাদের কাপড় অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয় না। অন্যদিকে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের অর্ধেকেরও বেশি এখনো আমদানি করতে হয়। এরপরে আছে হরতাল, রাজনৈতিক অসন্তোষ, বন্দরে অস্বাভাবিক সময় ক্ষেপণ। এসব কারণে আমাদের গার্মেন্টস প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকরা মাঝে মধ্যেই সময়মতো অর্ডার সরবরাহ করতে পারেন না।

গার্মেন্টস প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ মুক্ত বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সৃষ্টি করার জন্য সরকারকে চাপ দিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে বড় ধরনের একটি ওয়্যার হাউজ করবে যেখানে বিদেশ থেকে আগাম কাপড় এনে রাখা হবে। অর্ডার পাবার পর গার্মেন্টস প্রস্তুতকারকরা সেখান থেকে কাপড় কিনে নেবে। এতে কাপড় আমদানি করতে যে মাসাধিক সময় লাগে তা কমে যাবে। কিন্তু বিটিএমএ বলছে, সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হলে তা হবে দেশের বস্ত্র খাতকে ধ্বংস করার শামিল। বিটিএমএ নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের ৪ হাজার ২০০টি বন্ডেড ওয়্যার হাউজ আছে। এ অবস্থায় সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজের প্রয়োজন নেই। দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য যে কাপড় আনা হয় তার ১০ ভাগ অবৈধভাবে বাজারে বিক্রি হয়। সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হলে বিদেশী কাপড়ে দেশের বাজার সয়লাব হয়ে যাবে। এতে সম্ভাবনাময় বস্ত্রখাতের ব্যাপক ক্ষতি হবে।

বিটিএমএ নেতারা আরো বলছেন, বিশ্বব্যাংকের সহযোগী সংস্থা আইএফসি ভারত ও পাকিস্তানের বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ করেছে। তাদের বিনিয়োগ লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য আইএফসি-এর চাপে সরকার সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিজিএমইএ সভাপতি বলছেন যে, 'আমরা বাধ্য হয়ে বিদেশী কাপড় ব্যবহার করি। তারা এটা মনোপলি মার্কেট রেখেছেন তাদের কাছ থেকেই কিনতে হয়। সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হলে এবং রুলস অব অরিজিন শিথিল করা হলে ২ বছরে ৫ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ৭ বিলিয়ন ডলারে চলে যাবে।'

বার্ষিক উৎপাদনের হার

টেক্সটাইল স্পিনিং- ৫,০০,০০,০০০ কেজি ইয়ার্ন
ওভেন ফেব্রিক- ৯৬,০৭,০০,০০০ মিটার
নিটিং এবং নিট ডাইং- ১৩,৭০,০০০,০০০ মিটার (রপ্তানিযোগ্য)
৮০,০০,০০০ মিটার (দেশীয় বাজার)
ফেব্রিক প্রসেসিং- ৯৫,৪০,৯০,০০০ মিটার
এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড আরএমজি- ২১,৫০,০০,০০০ ডজন

দু'টি শক্তিশালী ব্যবসায়ী গ্রুপের এই পরস্পর বিরোধী চাপে সরকারের নীতি নির্ধারক মহল সিদ্ধান্তহীনতায় পড়েছে। শেষ পর্যন্ত কিছু শর্ত সাপেক্ষে সরকার সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নারী শ্রমিকদের নতুন কর্মক্ষেত্র

আমাদের রপ্তানি আয়ের ৭০ ভাগের বেশি আসে গার্মেন্টস থেকে। এই শিল্পের সিংহভাগ কারিগরই নারী। দেশের প্রায় চার হাজার গার্মেন্টসের উৎপাদনের চাকা ঘুরছে ২০ লাখ নারী শ্রমিকের হাতে। এই নারী শ্রমিকরাই গত তিন দশকে নিরন্তর ঘাম ঝরিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশের রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পকে। রেখেছে দেশের অর্থনীতিকে সচল। গার্মেন্টসে মেয়েরা কাজ করে এটা সবাই জানে। কিন্তু টেক্সটাইল মিলগুলোতেও যে মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে সে খবর অনেকেরই অজানা।

গার্মেন্টসের পরে নারী শ্রমিকদের বিকল্প কর্মক্ষেত্র হিসেবে টেক্সটাইল ইতিমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে। নারী শ্রমিকদের নিষ্ঠা, একাগ্রতার কারণে টেক্সটাইল মিল মালিকগণও মহিলা শ্রমিকদের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী।

ঢাকার আশপাশে এবং সারা দেশজুড়ে রয়েছে প্রায় ছশ'র মত টেক্সটাইল মিল। এর মধ্যে অবশ্য ডাইং মিলগুলোতে অতি উচ্চ তাপমাত্রা ও ভারী কাজের জন্য মেয়েরা এমনিতেই কাজ করতে পারে না, তবে বেশ কিছু উইভিং মিলে মেয়েরা কাজ করছে। তবে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে স্পিনিং মিলগুলোতে। গার্মেন্টসগুলোর সঙ্গে মিলগুলোর একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে গার্মেন্টসগুলো অবস্থিত বেশিরভাগই শহরের বিশেষ করে রাজধানীর ভেতর। অন্যদিকে টেক্সটাইল মিলগুলো প্রায় সবই লোকালয়ের বাইরে এবং বিশাল এলাকা জুড়ে। অধিকাংশ মিলেই শ্রমিকদের রয়েছে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। সেখানে এখন অবিরাম কাজ করে চলেছে অসংখ্য নারী।

নারী শ্রমিক বলতেই যে বোঝায় গার্মেন্টসের নারী শ্রমিক, এরা সেই ধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। মিল মালিকরাও যেখানেই সম্ভব সেখানেই মেয়েদের নিতে আগ্রহী। কারণ হিসেবে স্কয়ার টেক্সটাইলের ডিরেক্টর অপারেশনস **মোশতাক আহমেদ সিদ্দীকি** জানান, 'মেয়েরা স্বভাবতই সৃজনশীল এবং ধীরস্থির। শ্রমিক হিসেবে তারা যে

বিভিন্ন তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি অবস্থা

(মিলিয়ন ডলার)

পণ্য	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
ওভেন পোশাক	৩৩৬৪.২০	৩১২৪.৫৬	৩২৫৮.২৭
নিটওয়্যার	১৪৯৬.৩৬	১৪৫৯.২৪	১৬৫৩.৮৩
হোম টেক্সটাইল	১১৬.৫৮	৭৫.৫৮	৭১.৩৮
টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	১২১.৬৮	৪৮.০৮	২১.৭০
মোট তৈরি পোশাক ও	৫০৯৮.৮২	৪৭০৭.৪৬	৫০০৫.১৮
টেক্সটাইল পণ্য	(৭৮.৮৪%)	(৭৮.৬৩%)	(৭৬.৪৩%)
মোট রপ্তানি	৬৪৬৭.২৯	৫৯৮৬.৭৯	৬৫৪৮.৪৪

সূত্র : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

উপযুক্ত তার প্রমাণ বহু বছর ধরে আমরা গার্মেন্টসগুলোতেই দেখতে পাচ্ছি। মেয়েরা আমাদের এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যতদিন পারছে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাও তাদের চাহিদা, নিরাপত্তার প্রতি সবসময়ই সচেতন। এই মিলের উৎপাদন শুরু হবার সময় আমরা স্কয়ারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জানিয়ে দেই মহিলা শ্রমিক নিয়োগের কথা। সেই ভাবেই প্রচারিত হয়ে যায় এখানে কাজ পাওয়া যাবে। ফলে দূরদূরান্ত থেকেও আসতে থাকে মেয়ে, মহিলারা। প্রথমে আমরা প্রশিক্ষণ দেই, লেখাপড়া শিখিয়ে নিই। এখানে যারা আসে তাদের অধিকাংশই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত অথবা কোনো না কোনো অসুবিধার কারণে লেখাপড়া করতে পারেনি।'

স্কয়ারে যে শিক্ষার সুযোগ তা-ই নয়, **মোশতাক আহমেদ সিদ্দীকি** পুরো স্কয়ার স্পিনিং এবং টেক্সটাইল ঘুরিয়ে দেখান, সেখানে রয়েছে চারশ' শয্যা বিশিষ্ট অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য চারতলা হোস্টেল। যেখানে দেখা গেলো মেয়েরা শুধু মানসম্মত পরিবেশে থাকছেই না বরং রয়েছে বিনোদনের জন্য ক্যাবল লাইনসহ টিভি, বিভিন্ন ইনডোর গেমের ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ ক'টি পত্রিকা। আছে সিক রুম, কেউ অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজ রুম থেকে এ রুমে এনে রাখা হয়। হোস্টেল দেখলে বিশ্বাস হয় না এখানে শ্রমিকরা থাকে। মনে হয় এটি কোনো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস। যার অবসর সে রান্না করছে, কেউ টিভি দেখছে, কেউ বা নিমগ্ন পত্রিকা পড়াতে। টেক্সটাইল মিলে কাজ করা অনেক পরিশ্রমের, তাই কোনো মেয়ে একটানা বহুবছর কাজ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এজন্য আমরা তাকে বের করে দেই না। এখানে যে কোনো শ্রমিককে আমরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি, এমনকি কর্মরত অবস্থায় কেউ যদি বড় ধরনের অসুস্থ হয়ে পড়ে তার সমস্ত দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি। সাধারণত যখন সে বুঝতে পারে মিলে আগের মতো কাজ করতে পারছে না তখন সে নিজেই বিদায় নিয়ে চলে যায়। চাকরি শেষে চলে যাবার সময় আমরা তাকে গ্র্যাচুইটির টাকা বুঝিয়ে দেই। এমনকি চাকরি অবস্থায় তাকে দেয়া হয় বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের টাকাও। প্রতি বছর স্কয়ার টেক্সটাইল তার লাভের ৫% তার সকল কর্মী যারা ৯,০০০ টাকার কম বেতন পেয়ে থাকে তাদের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়, সে হতে পারে মিলের কোনো কর্মকর্তা অথবা কোন কর্মচারী। এ টাকার পরিমাণ এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিলো ৪,২০০ টাকা।'

গফুর নাহার এখানে কাজ করতে এসেছেন দিনাজপুর থেকে। তার স্বামীও কাজ করেন এখানে, মিলের কাছেই তারা থাকেন বাসা ভাড়া নিয়ে। নব দম্পতি এই দু'জন মিলে কাজ করে সংসারের সব কাজও করেন দু জনে মিলে। এতে যেমন সংসারে এসেছে সচ্ছলতা, তেমনি এসেছে স্বনির্ভরতা। তিনি নিজেও প্রতি মাসে প্রায় ১৯০০ টাকা আয় করেন বলে সংসারের দেখাশোনা তার শাশুড়িই করে থাকেন। মিলে ঘুরতে গিয়ে দেখা হয় এক ১৮ বছরের তরুণী মোসাম্মৎ রহিমা খাতুনের সঙ্গে। পাবনা থেকে এ মিলের আরেক কর্মচারী তাকে এখানে নিয়ে এসেছে চার মাস আগে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর বর্গাচাষী বাবা তাকে আর পড়াতে পারেনি। বাড়িতে বাবা- মা ছাড়াও আছে এক ভাই ও আরো একটি বোন। এখন সে বাড়িতেও টাকা পাঠায়, মেয়ে বলে অন্যান্য কর্মচারী ছেলেরা কখনো বিরক্ত করে না বলে জানান। এদিকে সুফিয়া বেগম স্বপ্ন দেখেন তার ছেলেমেয়েরা একদিন দেশের শিক্ষিত নাগরিক হবেন। তার ছেলে এখন পড়ছে কলেজে আর মেয়ে ক্লাস ফাইভে। মিলে সুতার সঙ্গে নিজের জীবনের সুতাও গেঁথে চলেছেন তিনি অবিরাম। এখানে কেন কাজ

দেশে অবস্থিত মিলের সংখ্যা

সূত্র : বিটিএমএ বার্ষিক রিপোর্ট-২০০৩

স্পিনিং (ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং) মিল	১৬২
উইভিং (ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং) মিল	৩৫৬
টেক্সটাইল প্রোডাক্ট প্রসেসরস	৭০
সর্বমোট =	৫৮৮

স্কয়ার টেক্সটাইলের নারী শ্রমিকদের ডরমেটরি

দেশের শীর্ষস্থানীয় কিছু টেক্সটাইল ও স্পিনিং মিলের কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা

মিলের নাম	পুরুষের সংখ্যা	নারীর সংখ্যা
পদ্মা টেক্সটাইল মিলস লি. (প্ল্যান্ট-২)	৭৪৮	০
আকিজ টেক্সটাইল মিলস লি.	১০০	৩২২
আশরাফ টেক্সটাইল মিলস লি.	১৪৭৪	০
ইকো কটন মিলস লি.	৩৭	৬৪৫
ফকির কটন মিলস লি.	২১৭	০
গুলশান স্পিনিং মিলস লি.	৪৬৫	৫৬
গিভেন্সি স্পিনিং মিলস লি.	৩২	৫৫১
কর্ণপারা স্পিনিং মিলস লি.	৮০০	৪০০
মালেক স্পিনিং মিলস লি.	৪০৪	৪৫
অটো স্পিনিং লি.	৪৬	৩৯৬
পদ্মা টেক্সটাইল মিলস লি.	১৫১৯	০
প্রাইম টেক্সটাইল মিলস লি.	২১	৫৫৭
রিলায়েন্স স্পিনিং মিলস লি.	৩১৫	৫০
সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লি.	৫১০	৫২৩
সিনহা টেক্সটাইল গ্রুপ লি.	৪০০০	৬০০
স্কয়ার টেক্সটাইল লি.	৬৭০	৩৮৮
টেকনো টেক্সটাইল মিলস লি.	১৯৫	৪৫৫

করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন- 'বছর শেষে এইখানে একসঙ্গে অনেক টাকা দেয়, যেইটা দিয়া পুলাপানেরে ইস্কুল-কলেজের বেতন দিবার পারি। তাছাড়া এইখান থেইক্যা চইল্যা যাবার সময়ও টাকা পামু, এই জন্য।' স্কয়ার টেক্সটাইল তার শ্রমিকদের আর্থিক দিকই নয়, লক্ষ্য রাখে তার মানসিক প্রশান্তির দিকেও। মোশতাক সিদ্দীকির ভাষায়, 'কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নিয়ে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস টুর্নামেন্ট। অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। যেখানে নাচে-গানে অনুষ্ঠানকে সাজিয়ে তোলে শ্রমিক-কর্মচারীই। এ সব নিয়ে আবার বার্ষিক প্রকাশনা 'দিশারী' বের করে শ্রমিক-কর্মচারীরাই। সেখানে লেখক-কবিও এরাই। সাহিত্যে, কবিতা, গল্পে ওদের প্রতিভায় আমরাও মুগ্ধ।'

স্কয়ার টেক্সটাইলে একজন শ্রমিককে চাকরির শুরুতে বেতন দেয়া হয় ৯০০ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১২০০ টাকা পর্যন্ত। তিন মাস পর থেকেই বেতন বাড়তে শুরু করে। The International Organization for Standardization (ISO)-এর সনদ ২০০৩-এর মে মাসে অর্জন করেছে স্কয়ার তার এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এ নিয়ে গর্বিত **মোশতাক আহমেদ সিদ্দীকি** বলেন- 'এ সনদ তারাই পেয়ে থাকে যারা আন্তর্জাতিক মানের উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ। এর সঙ্গে দক্ষ শ্রমশক্তির বিষয়টিও জড়িত। অর্থাৎ, আমরা পেরেছি আইএসও অনুযায়ী আমাদের শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে।' কিন্তু এই শত শত দক্ষ শ্রমিক যাদের সঙ্গে মিশে আছে শত শত স্বপ্ন ২০০৪-এর কোটামুক্ত বিশ্বের পরও কি তাদের এ স্বপ্ন টিকে থাকবে? 'স্কয়ার, বেক্সিমকো, সিনহার মতো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বপ্ন যে টিকে থাকবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ আমরা আন্তর্জাতিক মানের ফলে কোটামুক্ত আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা টিকে থাকবো এবং সেই সঙ্গে টিকে থাকবে আমাদের কর্মীদের সকল স্বপ্নও'- বললেন **মোশতাক আহমেদ সিদ্দীকি।**

শুরু করেছিলো মুকুল

মেয়েদের এই স্বপ্ন প্রথম দেখান গিভেন্সি স্পিনিং মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক **খতিব আব্দুল জাহিদ মুকুল**। বয়স্ক শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচালিত **মুকুল** প্রথম এ উদ্যোগ নেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি যখন প্রথম এ কথা বললাম আমার মিলের জিএম বলল, স্যার, এটা কি করে হয়? তার এ ভাবনা স্বাভাবিক, কারণ একটি টেক্সটাইল মিলে ২৪ ঘন্টাই কাজ হয়, শ্রমিকরা ৩ শিফটে এখানে কাজ করে। রাতের শিফটে যারা থাকবে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। আমি বললাম- এক শিফটে যদি ২৪০টা মেয়ে আর ৬০টা ছেলে শ্রমিক কাজ করে তবে ক'টা ছেলে সাহস পাবে মেয়েদের বিরক্ত করার, যদি করেও সকালে আপনি আসবেন, বিকেলে আমি- ওর ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এতো মার সহ্য করবে।' গিভেন্সি স্পিনিং মিলে গিয়ে দেখা গেল সেখানে প্রোডাকশনের প্রায় সকল শ্রমিকই মেয়ে। শ্রমিক হিসেবে মেয়েরা

'এতো বছর গার্মেন্টস শিল্প মালিকরা একচেটিয়া ব্যবসা করে গেছে, কিন্তু এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা কী করেছে'

এম. এ. আওয়াল
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)

বর্তমানে বাংলাদেশে সব শিল্পের মধ্যে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পই সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে এবং থাকবে। তেমনি থাকবে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত মহিলা শ্রমিকদের স্বপ্নও। বরং ২০০৪-এর পর কোটামুক্ত বিশ্বে আমরা আরো ভালো অবস্থানে পৌঁছে যাব। গার্মেন্টেসের ক্ষেত্রে ৫০টি এলডিসিভুক্ত দেশের মধ্যে আমরাই একমাত্র দেশ যাদের টেক্সটাইল সেক্টর অনেক সমৃদ্ধ। চীন যেখানে তার পোশাক শিল্পের শতকরা ৫৭ ভাগ কাঁচামাল আমদানি করে, সেখানে আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পে তারচেয়ে কম আমদানি করতে হয়। তাছাড়া চীনে শতকরা ২০ ভাগই বন্দি শ্রমিক। অন্যদিকে ভারত সরকার তাদের দেশে কৃষি খাতে ভর্তুকি দিয়ে চলেছে। বরং আমাদের সুতা, কাপড় ব্যবহারে ভারত থেকে আমদানি করায় যে খরচ হয়নি তার থেকে দেশীয় সুতা কাপড় ব্যবহারে খরচ শতকরা ৮ ভাগ কম হয়। সারা বিশ্বে ফ্যাশন পরিবর্তনশীল। একই রঙের কাপড়ে রয়েছে হাজার রকমের শেড। পার্থক্য আছে কাপড়ের গঠনেও। সেক্ষেত্রে গার্মেন্টস শিল্প রক্ষায় সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কোনো সমাধান নয়। বরং পরবর্তীতে দেখা যাবে কম মূল্যে এ কাপড় দেশীয় বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে, যার মন্দ প্রভাব পড়বে আমাদের দেশীয় কাপড়ের ওপর। এছাড়া এই বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কে স্থাপন করবে, কোথা থেকে আসবে এতো টাকা এবং কারা এর দায়িত্ব নেবে সেগুলোও বড় প্রশ্ন। অথচ দেশে অনেক ইন্ডিভিজুয়াল ওয়্যার হাউজ তো রয়েছেই। বরং নজর দিতে হবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থাপনার দিকে। এতো বছর গার্মেন্টস শিল্প মালিকরা একচেটিয়া ব্যবসা করে গেছে, কিন্তু এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা কী করেছে? ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ স্থাপনে তারা কিছুই করেনি। করেনি স্থায়ী কোনো ফ্যাক্টরি। আজও ভাড়া বাসায় গার্মেন্টস কারখানা ঢাকা শহরের সমস্যা হয়ে আছে। এই সমস্যা অনেকটা ওয়াইটুকে সমস্যার মতো। ২০০০ সাল আসার আগে আমাদের মধ্যে ওয়াইটুকে নিয়ে ছিলো বহু ভয়, ভীতি। শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। এক্ষেত্রেও কিছু হবে না। বরং টেক্সটাইল সেক্টর বর্তমানের চেয়ে ভালো অবস্থানে চলে যাবে।

গত কয়েক বছর ধরেই মেয়েরা টেক্সটাইল মিলগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে কাজ করে চলেছে। এমনকি বিপুল পরিমাণে মেয়েরা শ্রমিক হিসেবে রয়েছে আমার নিজের মিল প্রাইমেও। আমি তো মনে করি, শ্রমিক হিসেবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক গুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিল্প-কারখানায় উৎপাদনের হারকে ধরে রাখাই প্রথম কথা। এটা সম্ভব কারখানার পরিবেশ শান্তিপূর্ণ হলে। ছেলে শ্রমিকরা একাধারে কাজ করতে চায় না। তারা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারবে, সেই সঙ্গে কোনো না কোনো ঝামেলার সৃষ্টি করবে। আর মেয়েরা কাজের ফাঁকে সংসারের খোঁজ-খবর নিতে ছুটে যায়। সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমি বলবো, দক্ষ পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অদক্ষ মহিলা শ্রমিক বহু গুণে ভালো। তাছাড়া মেয়েদের মধ্যে কাজের প্রতি সিনসিয়ারিটি, কমিটমেন্ট পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি। আমার মিলটি নারায়ণগঞ্জে লোকালয়ের কাছেই। আমি মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ার পরও লোকালয়ের পাশে হওয়ায় তারা পরিবার নিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

‘আমাদের শ্রমিকরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক’

তপন চৌধুরী
ব্যবস্থপনা পরিচালক, স্কয়ার টেক্সটাইল

স্কয়ারের এ পর্যন্ত আসার পেছনে মূল কৃতিত্ব আমাদের শ্রমিকদের। তেমনি মহিলা শ্রমিকদের কৃতিত্ব আরো বেশি। কাজ করতে গিয়ে তারা যে বাধ্যবাধকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, তা বলার মতো নয়। এই শ্রেণীর মেয়েরা অধিকাংশই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিছুদিন আগেও তারা ছিলো তাদের পরিবারের বোঝার মতো। এখন তারা কাজ করে আয় করায় তারা শুধু নিজেদের একটি ভালো অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে তা নয়, তাদের পরিবারেও হাসি ফুটিয়েছে। স্বাবলম্বী হবার কারণে আজ তাদের ভালো বিয়েও হচ্ছে। এটি একটি সামাজিক পরিবর্তন। তারা নিজেরাই এটা অর্জন করেছে। আমাদের শিল্প খাতের আজকের এই অবস্থানে আসার কারণ শুধু এই শ্রমিক। আমি তো বলবো, আমাদের শ্রমিকরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক। বিদেশে টাকা দিয়েও এ শ্রমিক পাওয়া যাবে না। ৮ ঘন্টা নির্দিষ্ট ডিউটির পর যতো টাকার অফার দেয়াই হোক না কেন, সে কাজ করতে রাজি হবে না। কারণ ওই মুহূর্তে তার মানসিক বিনোদন, ডিসকোতে যাওয়া, গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করা তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মালিকের সর্বনাশ হলো কি না হলো তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ আমাদের শ্রমিকরা, রাতে কোনো জরুরি শিপমেন্ট, যদি বলি ‘বাবারা একটু করো তো’, হাসিমুখে করে দেবে। কারণ আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি এখনও বড়দের মুখের ওপর আমাদের না বলতে শেখায়নি। ওভারটাইম পেমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে চা-শিঙ্গাড়া দিলেই তারা তৃপ্ত। এই শ্রমিক বিশ্বে কোথাও টাকা দিয়েও পাওয়া যাবে না। এদের কারণেই টেক্সটাইল শিল্পও টিকে থাকবে। যে কোনো শিল্প টিকে থাকার জন্য চাই কাজ। আমরা কাজে বিশ্বাসী। মানসম্পন্ন কাজ করতে পারলে টিকে থাকা অবশ্যই সম্ভব। মানসম্পন্ন কাজের জন্য চাই সততা, নিয়মানুবর্তিতা। আমার অফিস শুরু হয় সকাল ৮.৩০ থেকে। আমি নিজেই পৌনে ৮টায় পৌঁছে যাই। আমি সময়মতো আসি বলে আমার এই অফিসে প্রায় ৪,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীও ঠিক সময়েই আসে। আমি তো মনে করি কোটামুক্ত হবার পরও আমাদের অবস্থান টেক্সটাইল বিশ্বে আরো শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যাবে। গার্মেন্টস খাতে রাজস্ব আয় অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছর আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে দেশীয় সুতা, কাপড় ব্যবহার করা অনেক বেশি লাভজনক। কারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব যখন-তখন সুতা, কাপড় সরবরাহ করা। এর জন্য কোনো এলসি খোলার প্রয়োজন পড়ে না, আর সময় তো একটি বিশাল ব্যাপার। তারপরও যদি কোনো সমস্যা ধরা পড়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরত নিয়ে বদলে দেব। যে সুবিধা আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে কোনো সমাধান নয়, বেশিদূর দেখতে হবে না। গুটিকয়েক মানুষের দিকেই আপনি তাকিয়ে দেখুন, তাদের কারো কাপড়ের সঙ্গে রঙের মিল পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেলেও তাদের কাপড়ের ধরন, বুনন এক কি না। তাছাড়া ফ্যাশন কোনো ধ্রুব ব্যাপার নয় যে তা স্থির থাকবে। সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই সম্ভব নয় বায়ারের অর্ডারের জন্য আগে থেকে কাপড় সংগ্রহ করে এনে রাখা। সুতরাং, সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ নয়, আমাদের এ বৃহৎ শিল্পকে টিকিয়ে রাখবে শুধু আমাদের নিজস্ব দক্ষতা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সঠিক সিদ্ধান্ত। তবেই থামবে না এই মেয়েদের জীবনের পথচলাও।

টেক্সটাইল মিলের জন্য কেমন জানতে চাইলে এ মিলের জেনারেল ম্যানেজার **গোলাম রসুল** বলেন- ‘অবশ্যই ছেলেদের চেয়ে ভালো। মেয়েরা কাজ করলে মিলের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকে এবং উৎপাদনের হারও একই থাকে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব শুরু করলেও ফ্লোরে সবসময়েই কোনো না কোনো কর্মকর্তা ইনচার্জে থাকেন। ফলে তারা কথা বললে শুনে এবং ছেলেদের মতো কাজে ফাঁকি দেয় না বা কোনো প্রকার ঝামেলা সৃষ্টি করে না।’ মেয়েদের জন্য গিভেন্সিতে কী কী সুবিধা রয়েছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন- ‘আমাদের মিলে প্রায় অধিকাংশ শ্রমিকই মেয়ে। যাদের বেশির ভাগকেই আনা হয়েছে আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুকুল সাহেবের নিজ জেলা পাবনা থেকে। অন্যদের মাঝেও অনেকে এসেছে অনেক দূরদূরান্ত থেকে। তাই এদের থাকার জন্য রয়েছে তিনটি হোস্টেল, যেখানে মেয়েদের বিনা খরচে রাখা হয়। তবে যারা বিবাহিত, সংসার করছে তারা মিলের আশপাশের গ্রামে রুম ভাড়া নিয়ে থাকে। শুধু খাওয়া খরচ বাবদ তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে জনপ্রতি ৪৫০ টাকা নেয়া হয়। এ নিয়ে সর্বসাকুল্যে তাদের খরচ প্রতি মাসে ৫০০ টাকার বেশি হয় না। খাওয়া খরচ নেয়া হয় বলে তাদের নিজেদের রান্না করারও প্রয়োজন পড়ে না। দিনে আটঘন্টা ডিউটি, বাকিটা সময় টিভি দেখে, গল্প করে, ইনডোর গেমস খেলে কাটানো। সপ্তাহে একদিন ছুটি। বেতন হিসেবে শুরুতেই তারা পেয়ে থাকে ৯০০ টাকা। তিন মাস পর থেকেই তা বাড়তে শুরু করে। এখানে অনেক মেয়ের আবার মোটা অঙ্কের ব্যাংক ব্যালেন্সও রয়েছে। কেউ আবার নিজের জমানো টাকায় বাড়িতে জমি কিনেছে, কেউ বা নিজের বিয়ের খরচ পর্যন্ত নিজে মিটিয়েছে।’ জিএমের কাছ থেকে জানা যায়, এখানে মেয়েদের ক্যাজুয়াল ছুটি ১০ দিন, মেডিক্যাল ৭ এবং বার্ষিক ছুটি ১২ দিন হয়। এ ছাড়া মেটার্নিটি ছুটিতেও তার বেতন কাটা হয় না। ঈদের সময় তাদের

নারী এবং পুর ষ শ্রমে ঘুরছে মিলের চাকা

বাস ভাড়া করে নিজ জেলায় পৌঁছে দেয়া হয়। কোনো ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয় কিনা জানতে চাইলে **গোলাম রসুল** জানান- 'এখানে অন জব ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে। তবে শ্রমিকদের মাধ্যে কর্মক্ষেত্র বদলানোর প্রবণতা অনেক বেশি। তারা বেশি দিন এক মিলে কাজ না করে অন্য মিলে কাজের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে বেশি বেতনে জয়েন করে।'

আমাদের সমাজে বখাটেদের উৎপাতের অভিজ্ঞতা কম বেশি সব মেয়েরই রয়েছে। মিলে কাজ করে শুধু শ্রমিকরা তাদের নিশ্চয়তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছে তাদের জীবনের নিরাপত্তাও। তেমনি একজনের সঙ্গে কথা হলো এ মিলে কর্মরত লাভলী আক্তার চৈতীর সঙ্গে। নারায়ণগঞ্জের স্কুলে পড়ুয়া মেয়ে চৈতীকে তার খালা এখানে নিয়ে এসেছে। কারণ বখাটে ছেলেদের অত্যাচারে স্কুলে যাওয়া তো দূরের কথা, বাইরেও বেরুতে পারত না সে। এখানে সে রয়েছে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে। এর মাঝে ২০ বছর বয়সী রহিমা আক্তার বাবা-মার দিকে পরিবারের একটি ছেলের মতই বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। পাঁচ ভাই-বোনের সংসারে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে আর পড়েন নি লেখাপড়ার খরচ যোগাতে। এখন নিজের খরচের পরও বাবা-মাকে প্রতিমাসে টাকা পাঠাতে পারছেন। বাবা এখন জমি কিনেছেন। সঞ্চয় করছেন তার বিয়ের জন্যও। স্বপ্ন দেখছেন সংসার সাজানোর। বিয়ের পর মিলে কাজ করার আগ্রহ নেই তার। সংসারে কাজের পাশাপাশি তার ইচ্ছে সেলাই করার। আবার শাহনাজ আক্তার জানালেন, বিয়ের পর স্বামীর অনুমতি মিললে কাজ করতে তার কোনো আপত্তিই থাকবে না। এখানে যারা কাজ করে তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই দেখা যায় তারা এখানকার সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট বলে বেশি বেতনেও অন্য কোথাও যেতে আগ্রহী নয়। প্রায় একই রকম চিত্র দেখা যায় সিনহা টেক্সটাইল গ্রুপে। কথা হয় সিনহার পরিচালক (কারিগরি) **সরওয়ার মহি আলমের** সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে প্রায় ছয়শ'র মতো মেয়ে তিন শিফটে কাজ করে চলেছে। যাদের বেশির ভাগই কাজ করছে স্পিনিং, উইভিং এবং ল্যাবে ল্যাবগার্ল হিসেবে। স্পিনিংয়ে আমি মনে করি মেয়েরা শ্রমিক হিসেবে বেশি উপযুক্ত। সুতা জোড়া দেয়া, গোনা, ড্রয়িং এ ধরনের সূক্ষ্ম কাজে মেয়েরাই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। শুরুতেই তারা ৯০০ টাকায় কাজে জয়েন করে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টাকার

'আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে যে শিল্প তাকে আমরা এতো সহজে ধ্বংস হতে দেব না'

আনিসুল হক

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)

যে মেয়েগুলো, মহিলাগুলো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেও যারা অন্যের বোঝা হয়ে চলছিলো, সেই মেয়েদের, মহিলাদের জীবনে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে আমাদের গার্মেন্টসগুলো। শুধু মেয়েদের সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নই নয়, গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্গে দেশের অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, ব্যাংক, শিপিং, ইন্স্যুরেন্সসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি নির্ভরশীল। কারণ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ আসে এই শিল্প থেকে। আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে যে শিল্প তাকে আমরা এতো সহজে ধ্বংস হতে দেব না। এর জন্য আমরা দেশের ভেতরে এবং বাইরে কাজ করে যাচ্ছি। উদ্যোগ নিয়েছি হরতাল বন্ধের। এখানে দুটো বিষয় কাজ করছে- লিড টাইম এবং মূল্য। তবে আমার বিশ্বাস, এ শিল্পের বিস্তৃতি আরো বাড়বে। তবে এর জন্য প্রয়োজন আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা। আমরা চাইছি আমাদের পণ্য নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বাজারে প্রবেশ করতে, চাই সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ। সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হলে শুধু আমাদের নয়, উপকৃত হবে টেক্সটাইল শিল্পও। কারণ এখানে কাপড় থাকবে অল্প পরিমাণে, থাকবে সুতা, যন্ত্রপাতি। এটা ঠিক যে, ক্রেতা কি অর্ডার দেবে তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কাপড় রয়েছে যার প্রয়োজন সব সময়ই। যেমন গ্রে এবং ডেনিম। গ্রে ফেব্রিক প্রয়োজন অনুসারে ডাই করে ব্যবহার করা হবে। এমনটি হলে দেশে যথেষ্টসংখ্যক ডাইং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে। তবে এ সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ আমরা নিজেরা করবো না। '৮০ সালে যখন এ শিল্পের যাত্রা শুরু হয় তখন কেউ ভাবতেও পারেনি, এ শিল্প একদিন ৫ বিলিয়ন ডলারের শিল্প হয়ে দাঁড়াবে। এ শিল্প টিকে থাকাটাই হচ্ছে বড় কথা, তবেই অন্য সব শিল্প টিকে থাকবে। আমরা বারবার বলেছি আমাদের জমি দিতে, যাতে আমরা গার্মেন্টস পল্লী গড়ে তুলতে পারি। সরকার দেয়নি। আগে ঢাকার বাইরে ইন্ডাস্ট্রি করলে শ্রমিক পাওয়া যেত না। সে কারণেই তখন সবাই ঢাকার ভেতর গার্মেন্টস কারখানা করত। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, ঢাকা থেকে বের হলেই ময়মনসিংহ পর্যন্ত দেখা যাবে শুধু গার্মেন্টস কারখানা। টেক্সটাইল শিল্পে শ্রমিক হিসেবে মেয়েদের জন্য কি করা হচ্ছে তা আমি জানি না তবে তাদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ তাদের মহিলা শ্রমিক যদি হয় এক লাখ আমাদের সেখানে দশ-বারো লাখ। অল্পসংখ্যক কর্মচারী হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাদের জন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা অসম্ভব কিছু নয়। আর শ্রমিকদের ট্রেনিং দেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়, অন জব ট্রেনিংই যথেষ্ট- এটাই বাজার অর্থনীতি। মূল শিল্পই যদি টিকে না থাকে, দক্ষ শ্রমিক দিয়ে কী হবে! আগে প্রয়োজন দেশের এই প্রধান শিল্প খাতটিকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা।

‘২০০৪ সালের পর টেক্সটাইল খাত আরো বিস্তৃত হবে বলে আমার ধারণা’

ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর
অধ্যক্ষ, কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি

উন্নয়ন সব সময়ই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। এমনকি দেখা যায়, যে এলাকায় কোনো টেক্সটাইল মিল অবস্থিত সে এলাকারণ সামগ্রিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মিলগুলো বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় হয় বলে সে গ্রামের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ঢাকা শহরে একটি মেয়ে বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপন করে, সেখানে সে গ্রামে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। বর্তমানে প্রয়োজন এই মেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং তা সরকারকেই করতে হবে। সেটা গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল দু’ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্যই। ২০০৪ সালের পর টেক্সটাইল খাত আরো বিস্তৃত হবে বলে আমার ধারণা। কারণ আমাদের দেশে তুলা উৎপাদন না হলেও বিশ্বের অনেক দেশ আছে যাদের কাছ থেকে আমরা সস্তায় তুলা কিনতে পারব। এমনকি ভারত থেকেও, যদি তা সময়মতো কেনা যায়। সেদিক থেকে চিন্তা করলে কিছুই বন্ধ হবে না বরং বিশ্বায়নের ফলে আমাদের সুযোগ আরো বেড়ে যাবে। কারণ আমাদের উৎপাদন বিশ্বমানের। সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ প্রতিষ্ঠা করা কোনো সমাধান নয়। কারণ কাপড় কোনো স্যান্ডার্ড আইটেম নয় যা গুদামজাত করে রাখা যাবে। এর ডিজাইন, ফ্যাশন পরিবর্তনশীল। তাছাড়া রয়েছে বুননে হাজারো পার্থক্য, এমনকি এক রঙেও রয়েছে হাজারো রকমের শেড। ক্রেতারা কখন কি ধরনের অর্ডার দেবে তা আগে থেকে বলা যায় না। অথচ এই অর্ডার অনুযায়ী ডেলিভারি দিতে গেলে আগে থেকে আনা কাপড়ে তা করা অসম্ভব। এর ফলে সেই গুদামজাত করা কাপড় কম দামে বাজারে বিক্রি করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। সেই সঙ্গে সম্ভাবনা রয়েছে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজের জন্য নাম করে দেশে-বিদেশী কাপড় এনে দেশীয় বাজারে বিক্রি করার। আরেকটি দিক, গ্রে কাপড় এখানে এনে রেখে দিয়ে প্রয়োজনমতো তা ডাই করে অর্ডার ডেলিভারি দেয়া। এটাও হাস্যকর। ধরা যাক, চীন যদি ১ টাকা দামে গ্রে কাপড় বিক্রি করে তবে সে তো ৫ টাকা দামে ডাই করা ফিনিশ কাপড়ই বিক্রি করতে পারে! সে ক্ষেত্রে কোনো দেশ গ্রে কাপড় বিক্রি করতে চাইবে না। উপরন্তু যদি করেও, তা ডাই করার মতো যথেষ্ট ডাইং ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে কোথায়? আমাদের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে ওভেন কাপড় তৈরির ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটাতে হবে। এখানে আমরা শুধু ব্যাচেলর ডিগ্রি দিয়ে থাকি। এরচেয়েও অনেক বেশি উচ্চশিক্ষিত বস্ত্র প্রকৌশলী প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ফ্যাশন ডিজাইনার। কারণ এখন পর্যন্ত আমরা বাইরের ডিজাইন কপি করছি, আর কিছুদিন পর থেকে এর জন্যও রয়্যালিটি দিতে হবে। বাড়াতে হবে গবেষণা। শুধু এই মহিলা শ্রমিকদের স্বপ্নকে ধরে রাখতেই নয়, আমাদের সবার প্রয়োজনেই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

পরিমাণ বাড়তে থাকে। এখানে মেয়েদের থাকার জন্য রয়েছে ডরমেটরি, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, কলেজ এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল। যেখানে তারা বিনা খরচে চিকিৎসা পেয়ে থাকে। এমনকি মেটার্নিটি লিভও আমরা দিয়ে থাকি উইথ পে।’ এ প্রসঙ্গে **সরওয়ার মহি আলম** বলেন- ‘টেক্সটাইল মিলে কাজ করা একটি মেয়ের জন্য প্রেস্টিজিয়াস জব গার্মেন্টসে কাজ করার চেয়ে। তাছাড়া গার্মেন্টসগুলোতে মেয়েদের থাকার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। নিজের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরের ভেতরেই মোটা অঙ্কের টাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে হয়। দেশের ৭৬ শতাংশ রপ্তানি আয় হচ্ছে গার্মেন্টস শিল্প থেকে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই মেয়েদের। গার্মেন্টস মালিকের থেকে শুরু করে মন্ত্রীর গাড়ির তেলের টাকা সবই আসছে এই মেয়েদের ঘাম ঝরানোর ফলে। তাদের ঋণ কেউ স্বীকার পর্যন্ত করে না। আজ পর্যন্ত করা হয়নি কোনো গার্মেন্টস পল্লী। করা হয়নি কোনো ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। কোটামুক্ত পৃথিবীতে এ প্রশ্নগুলোই সামনে এসে দাঁড়াবে। কারণ যে কোনো শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্যই চাই দক্ষ শ্রমিক। অন্তত সরকারের উচিত ছিলো একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরি করা।’ গার্মেন্টস শ্রমিকদের মতো টেক্সটাইল শ্রমিকদের বেতনও কম। তবে পার্থক্য এখানে, দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ট্রেনিং থাকার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন মালিক পক্ষ।

টেক্সটাইল মিলগুলো হাজারো মেয়েকে যেমন বাঁচিয়ে রেখেছে তেমনি স্বপ্ন দেখিয়েছে আগামীতে সুন্দর জীবনের। কিন্তু এ স্বপ্ন টিকবে আর কতদিন? ২০০৪ সালের পর কোটামুক্ত গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে আশঙ্কা অনেকেরই। আশঙ্কা কম নয় টেক্সটাইল শিল্পেও। কারণ এ শিল্পের সর্বশেষ পর্যায়ই গার্মেন্টস। যদি গার্মেন্টস শিল্প বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তাহলে নেতিবাচক প্রভাব টেক্সটাইল সেক্টরের ওপর পড়বে। কোটামুক্ত বিশ্ববাজার পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইতিমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ‘পোস্ট-এমএফএ ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এবং টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর আরএমজি সেক্টর’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাজ করছে। তাতে ২০০৪ সালের পর কোটামুক্ত বিশ্বে টিকে থাকার বিষয়ে চোদ্দটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম- অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ স্থাপন, ইমপোর্ট ডিউটি এবং সেলস ট্যাক্স কমানো, স্পিড মানি, দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশে গার্মেন্টস পল্লী গড়ে তোলা গার্মেন্টস ব্যবসায় ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণের। এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ তেমন কোনো পদক্ষেপ

অন্তত ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চোখে পড়েনি। সম্ভাবনাময় টেক্সটাইল শিল্পের জন্য গার্মেন্টস শিল্পের বেঁচে থাকাও জরুরি। আবার কোটামুক্ত বিশ্বে প্রতিযোগিতায় ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**